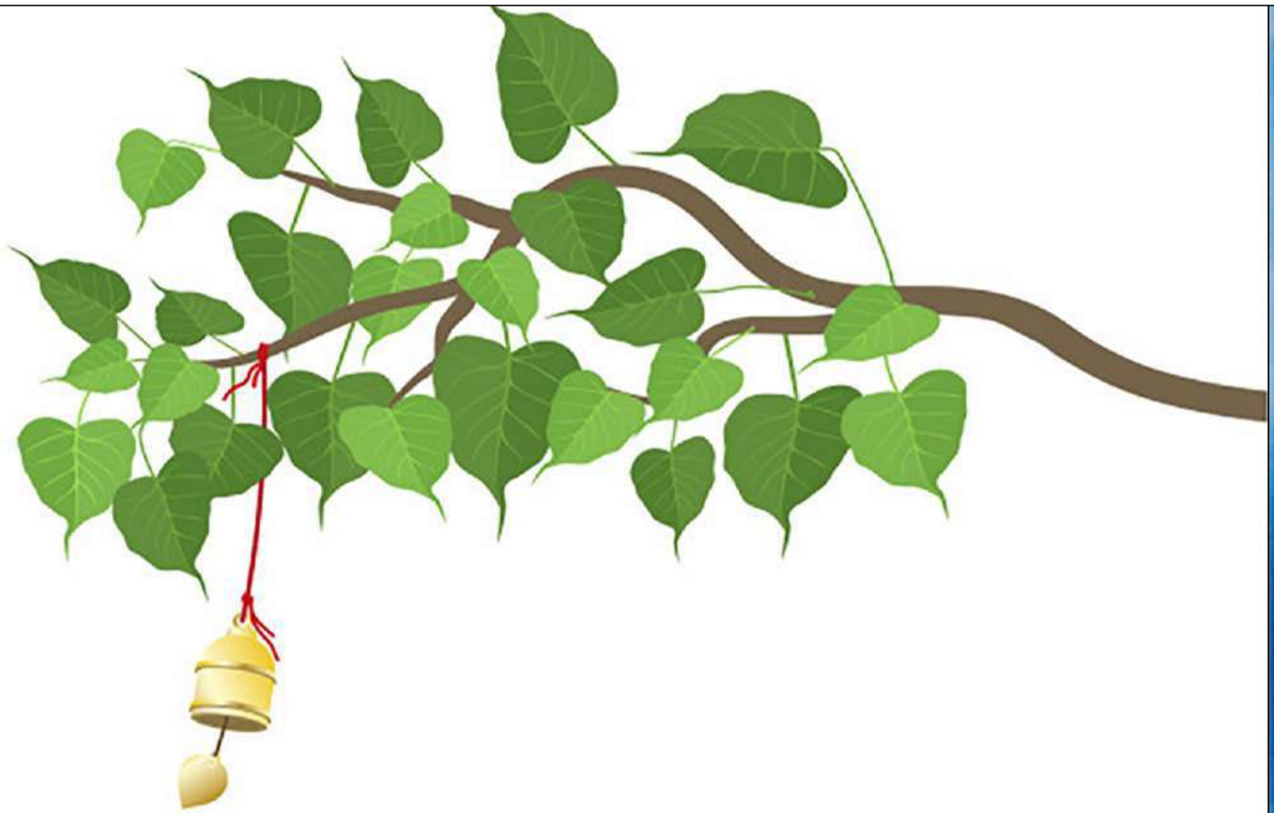

In Buddha We had the
Great Universal Heart
and Infinite Patience,
Making Religion Practical and
Bringing it to Everyone's Door.
– *Swami Vivekananda*

KHUDIRAM BOSE CENTRAL COLLEGE
71/2A, Bidhan Sarani, Kolkata - 700 006
Phone / Fax : (033) 2555 - 7102
www.khudirambosecentralcollege.com

Published by : Dr. Subir Kumar Dutta, Principal, KBCC
Printed at : Rohini Nandan, Kolkata- 700 012
Mail to: rohininandanpub@gmail.com

The Light

KBCC Annual Magazine 2018

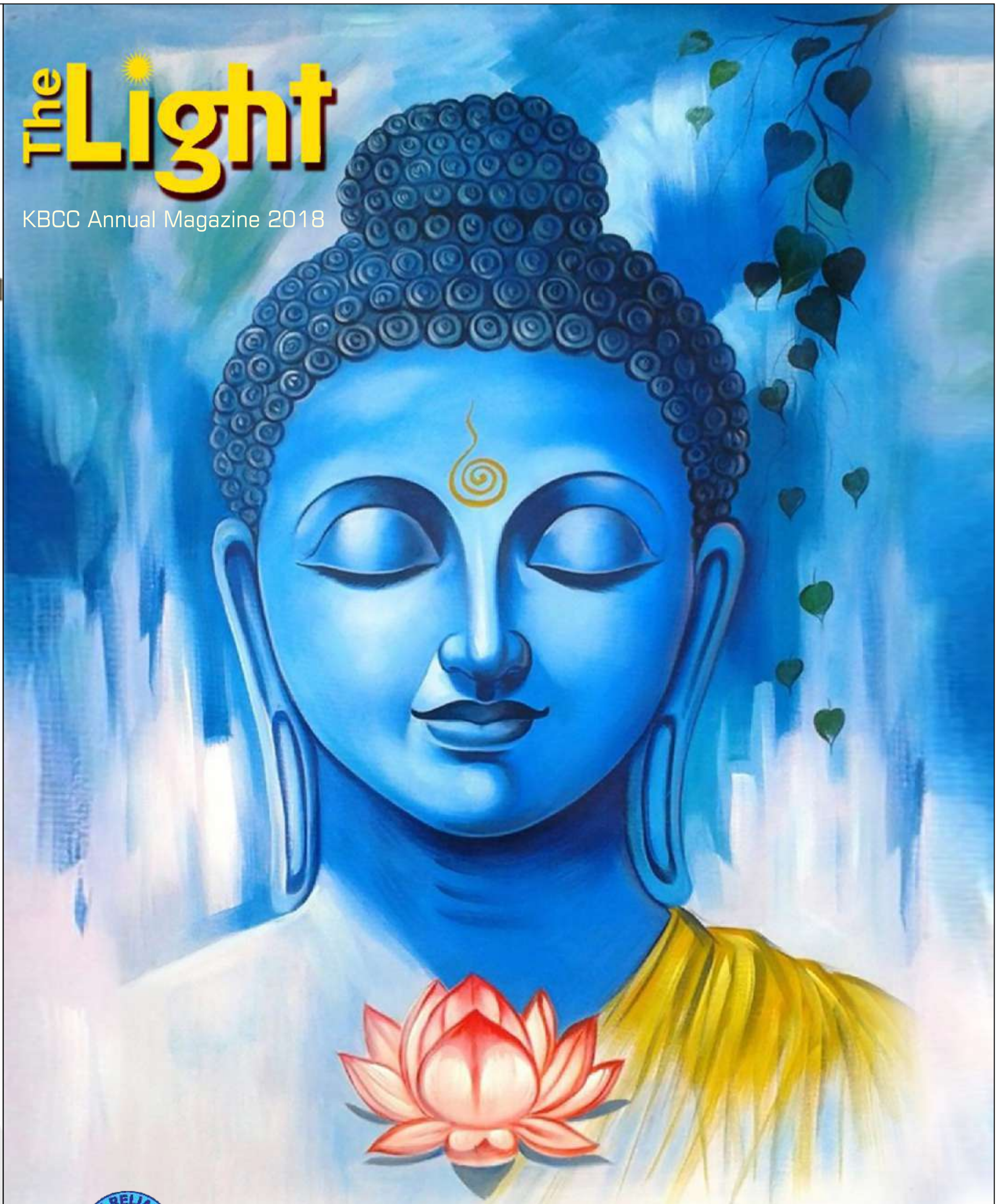

KHUDIRAM BOSE CENTRAL COLLEGE
www.khudirambosecentralcollege.com

Our Homage

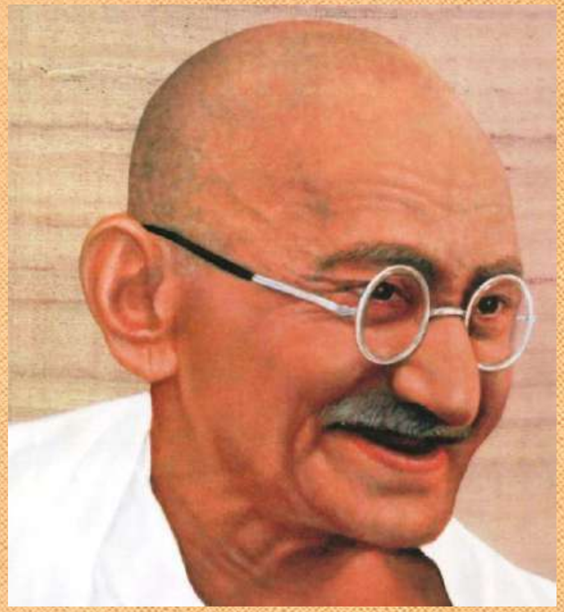

150th years Birth Anniversary of Mahatma Gandhi

125th years Birth Anniversary of J. L. Nehru

125th years Birth Anniversary of Dr. B. R. Ambedkar

Non Teaching Staffs

Library Members

College Students Union

The Light

2018

Khudiram Bose Central College
71/2A, Bidhan Sarani, Kolkata - 700 006
Phone : -033-2533-7102
Website : www.khudirambosecentralccollege.com
Email : khudiram.bose@gmail.com

॥ উপদেষ্টা মণ্ডলী ॥

শ্রী অশোক চৌধুরী

সভাপতি, পরিচালন সমিতি

ড. সুবীর কুমার দত্ত

অধ্যক্ষ

॥ সম্পাদক ॥

ড. শিল্পা নন্দী

॥ সম্পাদনা কর্মে সহযোগী কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা মণ্ডলী ॥

ড. শুভ্রা উপাধ্যায়

ড. শ্রীপর্ণা দত্ত

ড. সুব্রত কুমার মল্লিক

অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ঘোষ

অধ্যাপিকা রুদ্রাক্ষা পাণ্ডে

॥ মুদ্রণ সহযোগী ॥

রোহিনী নন্দন

১৯/২, রাধানাথ মল্লিক লেন, কোলকাতা - ৭০০ ০১২

ই-মেল : rohininandanpub@gmail.com

ঃঃ সূচিপত্র ঃঃ

পুরোভাষণ ৪
অশোক চৌধুরী
অধ্যক্ষের কলমে ৫
ড. সুবীর কুমার দত্ত
Acknowledgement ৬
Dr. Shilpa Nandy
সংগ্রহ থেকে ঃ হয়তো জানেন নয়তো জানুন ৭
ড. সুবীর কুমার দত্ত
মাধব পট্টনায়কের পুঁথি ও শ্রীচৈতন্যদেবের অজ্ঞাত তিরোধান কাহিনী ১২
হেমন্তকুমার আঢ্য
একটা নতুন বছর ২০
বিপ্লব মাইতি
প্রথম দিনের কলেজ ২১
সোনাম বসাক
ধর্মের বিপরীত মানুষ ২২
বিপ্লব মাইতি
ছুটির মজা ২৪
কৌশিক মুখার্জী
জীবনের লক্ষ্য ২৬
বিপ্লব মাইতি
সূর্য ২৭
আশামনজয় দোলাই
गुरु का महत्व २८
स्वाती शर्मा
कफन का शहंशाह २९
दिल प्रसाद
मेरे प्यरे पापा ३०
नेहा रवि दास
National Cadet Carps ৩১
Kakoli Sengupta
তুমি আছ তাই প্রেম আছে তাই ৩২
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা
জীবন ৩৩
সাগর প্রামাণিক, বি.এ. জেনারেল
বন্ধু নিয়ে প্রশ্নোত্তর ৩৪
বিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য
বিদেশ ৩৫
শিধু মণ্ডল
Incomplete Knowledge is DisastrousAlfa Bidya Bhyankari
Rajlaxmi Baruigupta ৩৬
ক্রীড়া সংবাদ ৪০
সুবিমল দেব

পুরোভাষণ

(পরিচালন সমিতির সভাপতির কলমে)

কলেজের মুখপত্র 'দ্য লাইট' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। এই প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানাই।

কলেজ পত্রিকা মূলত ছাত্রদের যদিও শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী এদের লেখাও এতে থাকে। নতুন কবিযশঃ প্রার্থীরা তাদের কল্পনার ডানা মেলেন প্রথম এই কলেজ পত্রিকাকে ধরেই। সেই অর্থে কলেজ পত্রিকাই আগামী দিনের লেখকদের সুতিকাগার। আমি বিশ্বাসকরি পত্রিকার এই সংখ্যাটি তার পূর্বসুরিদের মান অতিক্রম করে যাবে এবং সাহিত্যরস পিপাসুদের তৃষ্ণা মেটাবে।

অশোক চৌধুরী

অধ্যক্ষের কলমে

কেউ জানেনা আজকের এই মেঠোপথ হেঁটোপথ অলিপথ গলিপথ কবে রাজপথে পরিণত হবে। সবাই হয়তো হবে না তবে কেউ কেউ নিশ্চই হবে; যাদের ওপর মানুষের নির্ভরতা বাড়বে, যাদের সেই নির্ভরতা সামাল দেওয়ার সামর্থ হবে তারাই হয়ে উঠবে রাজপথ। কেউ জানে না— এই কলেজের এই ছেলেটা বা এই মেয়েটা এই কালোটা ওই ধলোটা, ওই বস্তির ওই কুঁড়েটার ওই শিশুটা একদিন বড়ো মানুষ হবে, বড়ো লেখক হবে, বড়ো সাহিত্যিক হবে অথবা বড়ো মনীষী হয়ে যাবে; সবাই হবে না কেউ কেউ হবে, চোখের সামনেই হবে, রাতারাতি হবে না, ধীরে ধীরেই হবে এবং নিশ্চিত ভাবেই হবে। যাদের ওপর মানুষের নির্ভরতা বেশী হবে যারা সেই নির্ভরতা দিতে সমর্থ হবে তারাই প্রকৃত মানুষ বা মনীষী হয়ে উঠবেন এবং মানুষের মনের মনিকোঠায় রয়ে যাবে চিরকাল।

প্রকৃত শিক্ষাই সাধারণ মানুষের নির্ভরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, মেঠোপথকে রাজপথে রূপান্তরিত করে এবং ধীরে ধীরে মানুষকে মনীষীতে উত্তরণ ঘটায় যুগ যুগ ধরে অচলায়তনের অন্ধকারকে দূরীভূত করার প্রয়োজনে মানুষ শিক্ষাকেই মূল হাতিয়ার করে এসেছে। শিক্ষাই মানুষের মনের সকল জীর্ণ সংস্কারকে দূরীভূত করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সবকিছু বিবেচনা করতে শিখিয়েছে। ভাবতে শিখিয়েছে অতীতের বহুযুগ ধরে চলে আসা ভাবনাগুলিকে যুক্তির নির্দেশতন্ত্রে রেখে পুনরায় বিবেচিত করতে যা সমাজের পক্ষে হিতকর কিনা।

আমাদের কলেজের ছাত্রদের মুখপত্র 'The Light' যা ছাত্রদের অন্তরের অভীক্ষণকে সবার সম্মুখে বীরদর্পে প্রজ্জ্বলন করার এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম। সাহিত্যের নানা অঙ্গন থেকে পুষ্প চয়ন করে সাজানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে এই পত্রিকায়। কখনো তাদের লেখায় বিচ্ছুরিত হয় স্নিগ্ধ শীতল অমৃত ধারা আবার কখনো বিচ্ছুরিত হয় অবদমিত হয়ে থাকা ভাবনার উত্তপ্ত লাভা যা আমাদের সকলের ভাবনাকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলবে। এটাই তো উদ্ভাবন।

দীর্ঘদিন ধরে সকল ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সংগৃহীত অমূল্য লেখাগুলিকে পুঞ্জীভূত করে এই 'The Light' পত্রিকার সফল প্রকাশ সম্ভব হতে চলেছে তা অত্যন্ত আনন্দের। এই পত্রিকা যদিও আমার, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র নয় তবুও এই লেখা যদি ছাত্রদের কলমকে ভবিষ্যতের বাঁচার হাতিয়ার করে তোলার জন্য এতটুকু অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে তবেই আমি সার্থক। আশা রাখি ছাত্র ছাত্রীরা এভাবেই তাদের ছাত্রজীবনে নিজেদের ভাবনাচিন্তাগুলোকে লিখিতরূপ দিয়ে নিত্য নতুন আনন্দ লাভ করবে। আবারও এই পত্রিকার সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করে সংশিষ্ট সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

ড. সুবীর কুমার দত্ত

Acknowledgement

I would like to express my sincere gratitude to many people who are associated directly and indirectly with this publication

First of all, I would like to thank Sri Asok Chaudhuri, President, Governing Body of this College; Principal, Dr. Subir Kumar Dutta for their support, encouragement and guidance while going through the process of publication and providing expertise knowledge in improving the quality of the magazine.

I would also like to thank all the contributors of this college-teachers and specially the students who have contributed such informative articles for this magazine.

Thanks to all my staffs and specially my commiittee members for helping me in the process of selection and editing.

Last and not least, thanks to Rohininandan Publishing house for printing this publication and giving it such a beautiful look. I beg forgiveness of all those who have been with me over the course of the years and whose names I have failed to mention.

Dr. Shilpa Nandy
Editor, The Light
Khudiram Bose Central College

সংগ্রহ থেকে ঃ হয়তো জানেন নয়তো জানুন

ড. সুবীর কুমার দত্ত
অধ্যক্ষ

১. পৃথিবী :

বর্তমান পৃথিবীর বয়স ১৬০ কোটি বছরের কিছু বেশি। পৃথিবীর জন্মের পর ৬০,০০০ বছর ধরে পৃথিবীতে কেবল বৃষ্টিপাত হয়েছে। আর এই বৃষ্টিপাতের ফলে পৃথিবীর উত্তাপ ক্রমশ রাশ পেতে থাকে। পৃথিবীর আদি পর্বে নিদারুন তাপমাত্রায় বিশ্বের অধিকাংশ শক্তিই ছিল রশ্মিময় এবং জ্যোতির্ময় অর্থাৎ সেটা ছিল— "Radiation-Dominated Universe"। যাকে শাস্ত্রে বলে— ব্রহ্ম অম্বু স্বরূপ জ্যোতির্ময়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"প্রথম আদি তব শক্তি
আদি পরমোজ্জ্বল জ্যোতি তোমারই হে
গগনে গগনে।"

এই বিশ্বের প্রাণের সৃষ্টির মূলে রয়েছে জল। আর বিশ্বে প্রাণ সৃষ্টির গোড়ার কথা— ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরান বলছে— মদনের কাম বানের প্রভাবে ভগবাত বিষ্ণুর রেতপাত হয়। দেবতাদের কাছে তা প্রকাশ পায় এমন আশঙ্কা থেকে তিনি সেই রেত সমুদ্রের জলে রেচন করেন। তারপর সহস্র সহস্র বছর সেই রেত সমুদ্রের জলে নিষিক্ত হয়ে ডিম্বরূপ ধারণ করে। কালক্রমে সেই ডিম্ব বিবর্ধিত হতে হতে এক মহা বিশাল রূপ নেয়। আর তখন তার প্রতিরোমকূপ থেকে সৃষ্টি হয় প্রাণের। জন্ম নেয় সব জীবজন্তু। অবশ্য আজ বিজ্ঞান বলছে জীবের উৎপত্তি ঠিক জলে নয় ঃ জল-স্থলের মিলন বেলায় অর্থাৎ আদ্রস্থানে। অনুমান আজ থেকে ১০ কোটি বছর আগে বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা আজকের সমান সমান ২১% হয়েছিল। তার আগে অক্সিজেন প্রায় ছিল না। তখন মাত্রা ছিল ০.০৬%। আজ থেকে মাত্র ২০ লক্ষ্য বছর আগে— দেখাদেয় স্থাবর, জলচর, কুর্ম, পক্ষী, পশু, বানর, তারপর আসে আজকের মানুষ।

ডারউইনের জন্মের কয়েকশ বছর আগে জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রে জানা যায়— মৎস, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি— এই দশ অবতার।

২. শালগ্রাম শিলা :

প্রাচীন ঋষিরা শালগ্রাম শিলার এই ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন

অহঞ্চ শৈলরূপী চ গণ্ডকী তীর সন্নিধৌ।
অধিষ্ঠানং করিষ্যমি ভাবতে তব শাশ্বত
বজ্রীকীটশ্চ কৃমায়া বজ্র দংষ্ট্রাশ্চএ তবৈ
মচ্ছিলা কুহরে চক্রং করিষ্যন্তি মদীয়কম।।

ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা বলছে মহাদেশীয় চলমানতায় বা কন্টিনেন্টাল ড্রিফটের ফলে প্রায় ৩ কোটি বছর আগে ইন্ডিয়ান প্লেটে এশিয়ান প্লেট যুক্ত হওয়ায় টেথিস সাগর থেকে মাথা তুলে দাঁড়ায় হিমালয় পর্বত। আর এই প্রাকৃতিক আলোড়নে সমুদ্রের প্রাণীকূল মাটি, বালি ইত্যাদি চাপা পড়ে জীবাশ্ম বা ফসিলে পরিণত হয়। শালগ্রাম শীলা এই রকমই এক ফসিল।

শালগ্রাম শামুকের মত গোলাকার বলে শালগ্রামকে বলা হয় MOLLUSE অর্থাৎ বজ্রকীট। এর গায়ে নানান নকশা ও ছিদ্র থাকে। কালী গণ্ডী (নেপাল) নদীর তীরে এই শীলা মেলে। ১৮ রকমের শালগ্রাম শিলা বলে জানা যায়। নেপালের গণ্ডকী নদীর গর্ভে শালগ্রাম নামে এক তীর্থের কথা বিশ্ব পুরাণে উল্লেখ আছে। হিন্দুরা ভগবান বিষ্ণুর প্রতীক হিসেবে এই শিলা পুজা করেন।

৩. দুর্গা :

দূর্গা নামটি উচ্চারণের সংগে সংগে আমাদের চোখের সামনে মহিষাযুর মর্দিনী মা দুর্গার ছবি ফুটে ওঠে। কিন্তু মহিষাসুর বাদেও বিভিন্ন সময় শান্তির রক্ষার জন্যে আরো যে সব অসুরদের তিনি নিধন করেছিলেন তারা হল— মধু, কেটৈভ, ধ্রুম্রলোচন, রক্তবীজ, শুম্ভ ও নিশুম্ভ।

৪. সান্টাক্লজ :

পিঠে উপহারের থলি, টুকটুকে লাল পোষাক ও মুখভর্তি সাদা লম্বা দাড়ি নিয়ে যে বৃদ্ধ ২৫শে ডিসেম্বর প্রতি বছর গভীর রাতে ঘুমন্ত শিশুদের মাথার কাছে রাখা উলের মোজার মধ্যে উপহার রেখে দেন বলে খ্রিষ্টান জগৎ বিশ্বাস করে— সেই সান্টাক্লজ কল্পিত রূপক নয়, বাস্তবের এক মানুষ। ব্যক্তিটির আসল নাম সেন্ট নিকোলাস।

চতুর্থ শতকে নিকোলাসের জন্ম সিরিয়ার পাটারাতে— বর্তমান তুরস্কের কালামাটি শহরের কাছে। এই নিকোলাস প্যালেসটাইন ও মিশর পরিভ্রমণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম তুরস্কের মাইরা শহরের গির্জায় বিশপ নিযুক্ত হন। রোম সম্রাট ডায়াক্লিশিয়নের

খৃষ্টান বিদ্বেষের সময় নিকোলাসকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেওয়া হয়েছিল। পরে পরবর্তী সম্রাট কনস্টানটাইন তাকে এই সাজা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি NICAEA (তুরস্কের বর্তমান ইউনিক শহর) শহরে প্রথম খৃষ্টান সম্মেলনে (৩২৫ খৃঃ) যোগ দিয়েছিলেন।

এই নিকোলাসের মৃত্যুর পরে তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নানান কিংবদন্তী। এ থেকে জানা যায় তিনি বিপদগ্রস্থ শিশু, বিপন্ন বহু নাবিককে সাহায্য করেছেন। এমন কী রক্ষা করেছেন। অপরাধীদের শাস্তি দিয়েছেন। কন্যাদায় গ্রস্থ পিতাদের সাহায্য করেছেন। তিনি নাকি একবার এক গরিব কিন্তু সৎ ব্যক্তির তিনকন্যার জন্যে তিন থলি সোনা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তিনি যখন রাতের জানালা দিয়ে সোনার থলি গুলো সেই লোকটির বাড়িতে ফেলছিলেন তখন কিছু সোনা একটা মোজার মধ্যে গিয়ে পড়ে। সেই থেকে প্রবাদ নিকোলাস মোজার মধ্যে উপহার রেখে যান। এই নিকোলাস নানান দেশে নানান নামে পরিচিত ব্রিটিশ শিশুদের কাছে ‘‘পেবে জোয়েলা”, জার্মানে ক্রিস ক্রিংগল, পর্তুগালে সিন্টার ক্লাশ। পর্তুগিজরা আমেরিকা অভিযানের সময় সিন্টার ক্লাশকে সেখানে নিয়ে যায়। আর আমেরিকাতেও সিন্টার ক্লাশ হয়ে ওঠেন সান্টাক্লজ।

৫. ভ্যালেন্টাইন ডে

রোম সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস যুদ্ধের প্রয়োজনে সাম্রাজ্য রক্ষার্থে অধিক সংখ্যক সৈন্য পেতে ছেলেদের বিবাহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন ২৬৯ খৃঃ এই আদেশ অমান্য করে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন গোপনে চার্চে নিয়ে গিয়ে আগ্রহী ছেলে মেয়েদের বিবাহ দিতে থাকেন। একথা জানতে পেরে ক্লডিয়াস— ভ্যালেন্টাইনের শিরচ্ছেদ করেন। দিনটি ছিল 14th Feb। সেই থেকে এই দিনটি ভ্যালেন্টাইন ডে বলে পরিচিত হয়। ভালবাসার মিলন দিবস।

৬. পায়রা কেন শান্তির প্রতীক

গ্রীকের দেবতা হর্না যুদ্ধ যাত্রার সময় শিরস্ত্রাণ নিতে গিয়ে দেখেছিলেন তার শিরোস্ত্রাণের মধ্যে একটি পায়রা বাচ্ছা দিয়েছে। এই দেখে হর্না শিরোস্ত্রাণটি নিলেন না এবং যুদ্ধে গেলেন না। এতে রক্ষা পেয়েছিল বহু জীবন। আর সেই থেকে পায়রাকে বলা হয় শান্তির প্রতীক।

৭. ১৯শে মে, ৬১

২১শে ফেব্রুয়ারীকে মাথায় রেখে— আমাদের ১৯৬১ সালের ১৯শে মে দিনটির কথা ভুললে চলবে না। শিক্ষার মাধ্যমে আবশ্যিক অসমিয়া ভাষাকে করার প্রতিবাদে কাছার জেলার বাংলা ভাষা-ভাষীরা ১৯শে মে শিলচর রেল স্টেশনে বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার্থে আন্দোলন করে ১১ জন

তরুণ-তরুণী প্রাণ দিয়েছিলেন, যাদের আমরা আজ প্রায় ভুলে গেছি। সেইসব শহিদেরা হলেন— শচীন্দ্র পাল, সুনীল সরকার, সুকোমল-পুরকায়স্থ, হিতেশ বিশ্বাস, কমলা ভট্টাচার্য্য, বীরেন্দ্র সূত্রধর, কানাইলাল নিয়োগী, তরণী দেবনাথ, চন্ডীচরণ সূত্রধর, সতেন্দ্র দেব এবং কুমুদ দাস।

৮. প্রথম সংবাদপত্র

ভারতে প্রথম সংবাদ পত্র হল ‘‘বেঙ্গল গেজেট অফ্ জেনারেল অ্যাডভারটাজার’’। এর প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারী। এই পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন জেমস আগসটাস হিকি। আর হিকির গেজেট নামেই পত্রিকাটি পরিচিত ছিল।

১৮০২ এর ডিসেম্বরে চিনগামী ‘‘আজাকস’’ জাহাজে হিকির মৃত্যু হলে তার দেহ সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই পত্রিকাতে সরকার বিরোধী কথা বলার জন্যে হিকির হাজতবাসও হয়েছিল। আজকের ‘‘ব্রেকিং নিউজ’’ কথাটাও হিকিই প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। সেই কত বছর আগে যা টি.ভি. চ্যানেল খুললেই চোখে পরে।

৯. মানুষের দৈর্ঘ্য

সত্যযুগে মানুষের দৈর্ঘ্য ছিল ২১ হাত
ত্রেতায় ছিল— ১৪ হাত
দ্বাপরে ছিল— ৭ হাত
কলিতে মানুষের দৈর্ঘ্য আজ ৩ হাত

১০. ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মশতবর্ষের উৎসবে কবিতায় রবীন্দ্রনাথের রামকৃষ্ণ বন্দনা

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব

বহু সাধকের
    বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমায়
    মিলিত হয়েছে তারা
তোমার জীবনে
    অসীমের লীলা পথে
নূতন তীর্থ
    রূপ নিল এ জগতে
দেশ বিদেশের

প্রণাম আনিস টানি
সেথায় আমার
প্রণতি দিলাম আমি।

১১. বিবেকানন্দের পছন্দের রবীন্দ্র সঙ্গীত

১) তোমারি তরে মা সপিনু এ দেহ। ২) এ কি সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ ৩) তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র-তপন, দেব-মানুষ বন্দে চরণ। ৪) সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি ৫) মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্ব পিতা ৬) মরিলো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে। ৭) তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা ৮) তুমি বন্ধু তুমি নাথ ৯) যোগী হে কে তুমি হৃদি আসনে ১০) কালী কালী বল রে আজ ১১) সখী আমারই দুয়ারে কে আসিল নিশিভোরে যোগী ভিখারী। ১২) গগনের থালো রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে।— এই গান গুলো স্বামীজী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময় পেয়েছেন। এর মধ্যে আবার বিশেষ কটি গান তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে বিভিন্ন সময়ে শুনিয়েছেন। যেমন— একী সুন্দর শোভা। কী মুখ হের এ। মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে। তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা— এমন কটি গান।

১২. সারা বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ কী?

ঋগ্বেদ। মোট সূত্র— ১০২৮টি। এই গ্রন্থে রয়েছে ১০৭১৭টি ঋক বা শ্লোক। এবং এই শ্লোক গুলো ১,৫৩,৪২৬ পদে বিভক্ত।

একাধিক গ্রন্থকার এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কাছে ঋণ স্বীকার।

"নিজের ওপর বিশ্বাস কখনো হারিয়ো না;
এ জগতে তুমি সব করতে পার।
কখনো নিজেকে দুর্বল ভেবো না,
সব শক্তি তোমার ভেতরে রয়েছে।"
—স্বামী বিবেকানন্দ

মাধব পট্টনায়কের পুঁথি ও শ্রীচৈতন্যদেবের অজ্ঞাত তিরোধান কাহিনি

হেমন্তকুমার আঢ্য
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

আমার কাছে প্রিয় বই-এর সংখ্যা এক নয়, একাধিক। আবার প্রিয় বই ছাড়াও, প্রিয় গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধ আছে। এসব লেখা বারবার পড়ি। বারবার আগ্রহ নিয়ে পড়ার ফলে সেই লেখাটির অনেক দিক চোখের সামনে খুলে যায়, অনেক জিনিসকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করি। আমার মনে হয় এই অনুভূতি আমার একার ক্ষেত্রে নয়, অনেকের ক্ষেত্রেই সত্য।

'শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব' বইটির ক্ষেত্রে 'প্রিয়' অভিধাটি ব্যবহার করা মুশকিল; কিন্তু বইটিকে অনায়াসে 'অতি বিশিষ্ট বই' বা 'একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ' হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।'

বইটির মলাটে ও আখ্যাপত্রে মাধব পট্টনায়ক বিরচিত বলা হয়েছে। ইনি 'মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত'। গ্রন্থটির ভূমিকা ও অনুবাদ 'বিষ্ণুপদ পাণ্ডা'র। কিন্তু গোটা বইটি পড়লে দেখা যায় লেখকের ভূমিকা ও বিশ্লেষণই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। বইটির নাম অনায়াসে হতে পারত 'মাধব পট্টনায়কের পুঁথি ও শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্য'।

বিষ্ণুপদ পাণ্ডা খ্যাতনামা গবেষক ও অধ্যাপক। বাংলা ইংরাজি মিলিয়ে তাঁর একাধিক বই আছে। তাঁর লেখা বহু প্রবন্ধও নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অধ্যাপনা ও গবেষণা ছাড়াও ভুবনেশ্বরের সরকারি পুঁথিশালায় দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়, 'ওড়িষ্যা রাজ্য পুঁথিশালায় আমার সুনির্দিষ্ট কাজ ছিল ওড়িষ্যার কবিদের রচিত বাংলা কাব্যগুলির লিপ্যন্তরণ ও সম্পাদনা।'

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ড. পাণ্ডা ভুবনেশ্বরবাসী গবেষক ও প্রাবন্ধিক প্রিয়নাথ সমাদ্দারের কাছে মাধব পট্টনায়ক রচিত 'চৈতন্যবিলাস' নামক পুঁথিটির কথা প্রথম শোনেন। এই মাধব পট্টনায়ক শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। বয়সে তিনি চৈতন্যদেবের চেয়ে কিছু বড়।

মাধব পট্টনায়কের মাত্র দুটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রথমটি আনুমানিক ১৫১৬

খ্রিস্টাব্দে রচিত 'চৈতন্যবিলাস'-এর পুঁথি, দ্বিতীয়টি ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'বৈষ্ণবলীলামৃত'-এর পুঁথি। ভুবনেশ্বরের সরকারি প্রদর্শনশালায় 'চৈতন্যবিলাস'-এর দুটি পুঁথি এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

মাধব পট্টনায়কের দ্বিতীয় পুঁথি ঃ 'বৈষ্ণবলীলামৃত'। পুঁথিটিতে শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলবাস ও তিরোধানের কথা আছে। চৈতন্যদেব ছাড়াও আরও অনেকের প্রসঙ্গ এসেছে মাধবের লেখায়; যেমন রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে কর্নাটকের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের যুদ্ধের কথা, প্রতাপরুদ্রের পুত্র বীরভদ্রের বন্দীদশায় আত্মহত্যার কথা, বীরভদ্রের মাতা প্রতাপরুদ্রের মহিষী চম্পা দেবীর বন্দী হওয়া, প্রতাপরুদ্রের কন্যা জগন্মোহিনীর সঙ্গে কৃষ্ণদেব রায়ের বিবাহ ও সন্ধি, পুরীর মন্দিরের নতুন অংশ ও প্রাচীর-বেষ্টনী তৈরিতে গজপতিবংশীয় রাজাদের ভূমিকা ইত্যাদি। এ ছাড়াও আছে সন্ত কবীরের কথা, বল্লভাচার্যের কথা, মাধবেন্দ্রপুরীর প্রসঙ্গ, ওড়িষ্যায় 'পঞ্চসা' নামে বিখ্যাত চৈতন্যদেবের পাঁচজন ওড়িয়া ভক্তের কথা, বাসুদেব সার্বভৌম ও কাশীনাথ মিশ্রের প্রসঙ্গ।

লেখক কয়েকটি তথ্যের সাহায্যে, বলা যায় মাধব পট্টনায়কের ওড়িয়া রাজাঙ্ক গণনা অনুসরণ ক'রে ১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যবের জন্ম অনুমান করেছেন। আত্মপরিচয় দিয়ে মাধব জানিয়েছেন ঃ

মু দীন মাধব পামর। ক্ষুদ্র কুলরে জন্ম মোর।।
মো পিতা নাম ভগবান। মামা মো হীরা দেবী জান।।
করণ বংশে জন্ম হই। পট্টনায়ক সংজ্ঞা বহি।।
খণ্ডপাড়া মোর জন্ম স্থান। শ্রীক্ষেত্র বাসে দেলি মন।।

২১ বছর বয়সে পিতামাতাকে হারিয়ে তিনি বেঁচে থাকার তাগিদে শ্রীক্ষেত্র বা পুরীর উদ্দেশে যাত্রা করেন। যাওয়ার পথে একদিন বেন্টপুর গ্রামে ভবানন্দ পট্টনায়কের বাড়িতে সাময়িক আশ্রয় পান। যেদিন মাধব ভবাবন্দের বাড়িতে থাকার সুযোগ পান, ওই একইদিনে মাধবেন্দ্রপুরী তাঁর দুই শিষ্য ঈশ্বরপুরী ও রাঘবপুরীকে নিয়ে ভবানন্দ পট্টনায়কের গৃহে অতিথি হন। সেখানে মাধবেন্দ্রপুরী ও অন্যান্যদের মুখে নাম-গান ও সংকীর্তন শুনে ঠিক করেন তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে থাকবেন এবং অধ্যাত্মজীবনকেই বেছে নেবেন। মাধবেন্দ্রপুরী অপরিচিত ও অদীক্ষিত মাধব পট্টনায়ককে সঙ্গে নিতে চাননি। তিনি তাঁকে ভবাবনন্দের আশ্রয়ে থেকে যেতে বলেন। আশ্রয়দাতা ভবানন্দ যখন জানতে পারেন মাধব শ্রীক্ষেত্র যাবেন বলেই পথে নেমেছেন, তখন তিনি তাঁকে নীলচলবাসী পুত্রের কাছে পাঠিয়ে দেন। এই পুত্রই হলেন রামানন্দ, পরবর্তীকালের রায় রামনন্দ। মাধবের অশেষ সৌভাগ্য— রামানন্দ তাঁকে গ্রহণ করলে, আশ্রয় দিলেন— তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। এমনকি তাঁকে পুঁথি লেখার কৌশলও শেখালেন। এই সময় সম্ভবত

রামানন্দ নিজের 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটক রচনা শেষ করেছেন এবং গজপতিরাজ প্রতাপরুদ্রকে শুনিয়ে 'রায়' উপাধি ও একটি স্বর্ণমণ্ডিত যষ্টি লাভ করেছেন। এটি ১৫০২ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। তখনও রামানন্দ ওড়িষ্যার রাজা কর্তৃক রামহেন্দ্রীর প্রশাসক হননি। এই ঘটনার কিছুকাল পরে গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

মাধব ছিলেন চৈতন্যদেবের নীলাচল-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী। আবার নিজে ওড়িষ্যার মানুষ হওয়ায় সমকালের বহু ঘটনা ও ব্যক্তির প্রসঙ্গ তাঁর রচনায় এসেছে। ড. বিষ্ণুপদ পাণ্ডা মন্তব্য করেছেন— এত বাস্তব বর্ণনা মধ্যযুগের কম লেখাতেই দেখা যায়। এত সাল তারিখ উল্লিখিত ওড়িয়া পুঁথিও তিনি আগে দেখেননি। চৈতন্যদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা মাধবের লেখার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে, কিন্তু তাঁকে অবতার রূপে প্রতিপন্ন করা বা অলৌকিক ঘটনাকে স্থান দেওয়ার ব্যাপার মাধবের পুঁথিতে খুব একটা নেই।

মাধব পট্টনায়কের 'বৈষ্ণবলীলামৃত' পুঁথি আবিষ্কারের ফলে বাংলা ও ওড়িষ্যার মধ্যযুগের ইতিহাসের অনেক ফাঁকফোকরই ভরানো সম্ভব হয়েছে, বিশেষ করে দুই প্রদেশের বৈষ্ণব ও ভক্তি-আন্দোলনের সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে। এগুলি বিদ্বৎসমাজে গৃহীত হলে পাঠ্যপুস্তকেও অদলবদল ঘটাতে হবে। এরকম কিছু নতুন তথ্য এখানে উল্লেখ করা যায় ঃ

১. চৈতন্যদেব পুরী আসার অনেক আগে থেকে রামানন্দ রাগানুগ মার্গের ভক্তিসাধনা করতেন। এই বিষয়ে তাঁর সুগভীর অধ্যয়ন ও চিন্তাভাবনা ছিল। শ্রীচৈতন্য পুরীতে এলে বাসুদেব সার্বভৌম তাঁর রাগমার্গের সাধনার ধারা লক্ষ করে তাঁকে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পরামর্শ দেন—

দক্ষিণ দেশে যিব।
রাম রায় সঙ্গ লভিব।।

এ প্রসঙ্গে ড. পাণ্ডার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ঃ 'ওড়িষ্যার প্রাণপুরুষ শ্রীজগন্নাথদেব। ওড়িষ্যার বৈধীভক্তি ও জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিবাদই স্বীকৃত। অথচ শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক তাঁর প্রেমধর্ম সম্পর্কে কিছু আলোচিত হবার মতো যখন কোনো পরিবেশ নবদ্বীপ বা অন্যত্র সৃজিত হয় নি, বিশ্বম্ভর যখন দীক্ষাও গ্রহণ করেন নি, তার বহুপূর্ব থেকেই রায় রামানন্দ রাগানুভক্তিমার্গই অনুসরণ করেছিলেন।'

২. মাধব পট্টনায়কের 'বৈষ্ণবলীলামৃত' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'শিক্ষাষ্টক'-এর শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হয়েছে, সেই সঙ্গে আছে শ্লোকগুলির ওড়িয়া অনুবাদ। এই শ্লোকগুলি স্বয়ং চৈতন্যদেব রচনা করেছেন বলে বৈষ্ণব সমাজে সুবিদিত। মাধব এই শ্লোকগুলির যে জন্ম-ইতিহাস এই ষষ্ঠ

অধ্যায়ে তুলে ধরেছেন, তা আর কোথাও পাওয়া যায় না।

ছোট হরিদাস শিখী মাহাতির ভগিনী বালবিধবা মাধবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, তণ্ডুল ইত্যাদি আনার অছিলার দেখা করতেন। ইনি মহাপ্রভু কর্তৃক পরোক্ষভাবে তিরস্কৃত হয়ে ক্ষমার আশায় কিছুকাল অপেক্ষা করার পর পুরী ত্যাগ করে যান ও প্রয়াগে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনা ছাড়াও ওড়িয়া ভক্তদের প্রতি বিশেষত পঞ্চসখার অন্যতম জগন্নাথ দাসেরস প্রতি চৈতন্যদেবের অসীম ভালোবাসা ও তাঁকে 'অতিবড়' ও 'স্বামী' আখ্যা দান নীলাচলবাসী গৌড়ীয় ভক্তদের ব্যথিত করেছিল। আরও দু-একটি কারণের সঙ্গে ছোট হরিদাসের আত্মহত্যার খবরে ক্ষুব্ধ হয়ে গৌড়ীয়-ভক্তরা পুরী ছেড়ে বাংলাদেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন। শিবানন্দ সেন চৈতন্যদেবকে স্পষ্টই জানান, এইসব ভক্তরা চৈতন্যদেবের জন্যেই পুরীতে ছিলেন; এখনন চৈতন্যদেবের কারণেই তাঁরা পুরী ছেড়ে যাচ্ছেন। এটা ভালো ব্যাপার নয়। তাঁদের শ্রীক্ষেত্রে পুনরায় ফিরিয়ে আনাই কর্তব্য ঃ

শিবানন্দ বলে হকার।
তোহর এ নহে বেভার।।
তোর নিমিত্ত এথে থিলে।
এবে সে সবে চালি গলে।।
একথা নোহি তোতে ভল।
লেইট অনাও ক্ষেত্রর।। (ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ৬৮-৭০ শ্লোক)

চৈতন্যদেব ভক্তদের ব্যথা বুঝতে পারেন। ঠিক হয় জগন্নাথ দাসকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যই তাঁদের ফিরিয়ে আনবেন। পরে ঠিক হয় শিবানন্দ সেনই চৈতন্যদেবের একটি চিঠি নিয়ে তাঁরই দূত হিসেবে ভক্তদের ফিরিয়ে আনবেন। তিনি জগন্নাথ দাসকে একটি চিঠি লিখতে অনুরোধ করেন ঃ

প্রভু বোইলা লেখ চিঠি।
ফেরিন আসিবে লেউটি।।
স্বামী লেখিলা আঠ শ্লোক।
প্রভুর ভাব সে যেতেক।।
প্রভুকু শ্লোক শুনাইলা।
বিভোলে প্রভু কোল কলা।।

জগন্নাথ দাস এগুলি স্বয়ং রচনা করেছেন অথবা মহাপ্রভুর রচিত বা কথিত শ্লোকই এখানে

গ্রথিত কিা তা স্পষ্ট নয়। শিবানন্দ সেন কিন্তু এটি মহাপ্রভুর রচনা বলেই নিয়ে গেলেন। যাজপুরে সে সময় বঙ্গীয় ভক্তরা অবস্থান করছেন। শিবানন্দ সেনের কাছ থেকে চিঠি ও বার্তা পেয়েও তাঁরা ফেরেননি।

৩. শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ স্বরূপ দামোদরের প্রয়াণের বছর ও তিথি মাধবই প্রথম স্পষ্ট ক'রে উল্লেখ করেছেন। মাধবের মতে মাঘ শুক্লা একাদশী স্বরূপের প্রয়াণ ঘটে। কাশী মিশ্রের বাসস্থান গম্ভীরাতেই তাঁর দেহবসান হয়। চৈতন্যদেবের নির্দেশে স্বরূপের দেহ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বিষ্ণুবাবু 'রাজাঙ্ক' বা স্থানীয় বর্ষ গণনা হিসাব করে জানিয়েছেন এটি ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ, সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাস।

স্বরূপ অসুস্থতার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে চৈতন্যদেবের কীর্তন-যাত্রার অংশ নিতে পারতেন না। তাঁর মৃত্যুর পর ওড়িষ্যার 'পঞ্চসখা' নামে বিখ্যাত পাঁচজন বৈষ্ণবের অন্যতম অনন্ত দাস, অচ্যুত দাস, যশোবন্ত দাস প্রমুখ তাঁর দেহ বহন করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে আসেন।

৪. মাধবের গ্রন্থ থেকে আর একটি বিস্ময়কর তথ্য জানা যাচ্ছে। তা হ'ল সে সময়ে কোনার্ক মন্দিরে পূজার্চনা হত এবং স্বয়ং চৈতন্যদেব চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করে সূর্য ও বিষ্ণুর পূজা করেছিলেন এবং এই মন্দিরের ক্ষীরনাড়ু প্রসাদ গ্রহণ করেছেন।

৫. মাধবের তথ্য অনুযায়ী গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের জন্মস্থান ওড়িষ্যার প্রাচী নদীর কূলে নিয়ালী-মাধব মন্দিরের কাছে কেঁদুলি গ্রামে। এই মত গ্রহণ করলে জন্মস্থান নিয়ে বাংলা ও ওড়িষ্যার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। মাধব আরও জানিয়েছেন প্রাচী নদীতে স্নান ক'রে চৈতন্যদেব নিয়ালী-মাধব মন্দিরে পূজার্চনা করতেন। এরপর কেঁদুলি গ্রামে গিয়ে তিনি নাম-সংকীর্তন করতেন।

৬. চৈতন্যদেবের পিতামহসহ পূর্বপুরুষের আদি বাসস্থান ছিল ওড়িষ্যার যাজপুরে। ওড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের সঙ্গে কোনো বিরোধে জড়িয়ে পড়ে বৎস-গোত্রীয় কুলীন ব্রাহ্মণ উপেন্দ্র ওড়িষ্যা থেকে পালিয়ে শ্রীহট্টে বসবাস করতে থাকেন। উপেন্দ্রের সন্তান জগন্নাথ শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে চলে আসেন। সেখানেই তাঁর পুত্র নিমাই-এর জন্ম। যাজপুরে চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ বংশজ অনেকে থাকতেন। চৈতন্যদেব যখন পূর্বপুরুষদের গ্রামে যেতেন, তখন সেখানকার গৃহস্থরা অঙ্গন মার্জনা করে, ঘট ও দীপ স্থাপনা করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতেন। চৈতন্যদেব সেখানে কীর্তনও করতেন।

৭. মাধব পট্টানায়কের পুঁথির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ঃ চৈতন্যদেবের প্রয়াণ সংক্রান্ত বিবরণ। 'বৈষ্ণবলীলামৃত'-এর নবম অধ্যায়ে এ ব্যাপারে তিনি দীর্ঘ-বিবরণ দিয়েছেন (৪৬-৯১ শ্লোক)।

অক্ষয় তৃতীয়ার আগে যে অমাবস্যা পড়ে তাকে বলা হয় রুক্মিনী অমাবস্যা। তখন সায়াহ্ন। মন্দিরের অদূরে ভক্তদের নিয়ে চৈতন্যদেব সংকীর্তন ও নৃত্য করছিলেন। আত্মহারা হয়ে নৃত্যের সময় রাস্তায় পড়ে থাকা ইঁটের টুকরোর ওপর তাঁর পা পড়ে। কাতরোক্তি করে পা মুড়ে তিনি পড়ে যান। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে অঝোরে রক্ত পড়তে থাকে। তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। কাশীশ্বর মিশ্র, যশোবন্ত, শ্রীবৎস, অনন্ত প্রমুখ একত্র হয়ে তাঁকে সম্ভাষণ করেও কোনো উত্তর পান না। তাঁকে কাঁধে করে মন্দিরের উত্তর পার্শ্বস্থিত মণ্ডপে নিয়ে চিৎ করে শুইয়ে দেওয়া হল। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিক ছিল কিন্তু তিনি অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিলেন। চোখে মুখে জলসিঞ্চনের পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। ড. পাণ্ডার অনুবাদ ঃ ‘চেতনা ফিরে পাওয়ার পর তিনি চোখ মেলে চাইলেন এবং সমবেত সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। জগন্নাথ দাস প্রভুর মুখের কাছে সরে এসে তাঁকে কথা বলতে অনুরোধ জানালেন, কিন্তু তখনও তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। সন্ধ্যার পরে জগন্নাথ দাস ছাড়া অন্য সকলে চলে গেলেন। কিন্তু সংবাদ পেয়ে রায় রামানন্দ এসে পৌঁছলেন। ততক্ষণে শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় হয়ে গিয়েছে। খোল করতাল ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের গম্ভীর শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

প্রভু বললেন, ‘আমাকে নিয়ে চল, আমি শ্রীজগন্নাথদেবের সামনে ভক্তদের নৃত্য একটু দেখে আসবো।’ জগন্নাথ তাঁকে ধরে বসালেন আর বললেন, ‘তুমি যাবার ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। বরং এখানে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাক। তোমার পায়ে গভীর ক্ষত হয়েছে, একহাত পরিমিত স্থানও তোমার পক্ষে এখন হাঁটা সম্ভব নয়। তোমার পান-ভোজনের ব্যবস্থা আমি এখানেই করবো এবং সারাক্ষণ তোমার কাছেই থাকবো।’

রাত্রি প্রভাত হল। তখন শ্রীচৈতন্যের শরীরে প্রবল উত্তাপ দেখা গেল। মনে হতে লাগল যে শরীরে ধান ছড়িয়ে দিলে খৈ হয়ে যাবে। সরাসরি জ্বরভোগের পর সন্ধ্যার দিকে তার পা ফুলে গেল। সেই সঙ্গে বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিটির যন্ত্রণা বর্ধিত হল। জগন্নাথ একটু জল গরম করে নিয়ে লেন আর তাতেই শ্রীচৈতন্যের বাম পায়ের পাতাটি ডুবিয়ে রাখলেন। জগন্নাথ প্রশ্ন করলেন, ‘জল কি বেশি গরম ঠেকছে?’ মনে হয় জল বেশি গরম ছিল। আর একটু ঠাণ্ডা করার পর সেই জলে পা ডোবালেন। তাতে জগন্নাথ দাসের মনে হল, শ্রীচৈতন্য কিঞ্চিৎ আরামবোধ করছেন। কিন্তু শরীরের জ্বর কমছিল না। রাতে প্রবল কম্পন উপস্থিত হল।

জগন্নাথ শ্রীচৈতন্যের পাশেই বসেছিলেন। তিনি জগন্নাথকে বললেন, ‘তুমি আমার কাছ থেকে যেও না। তুমি থাকলে আমার কষ্টের অনেকখানি লাঘব হবে। শ্রীহরির ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তুমি শ্রীজগন্নাথদেবের অন্যতম প্রধান সেবক। আমি তোমার সেবা পাচ্ছি, আর আমার কি চাই। তিনি হয়তো আমার এই দৈহিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে আমাকে তার ‘নিজ ধামে’ই টেনে নেবেন।’

এরপর সঙ্গী জগন্নাথ দাস যে পরম ভক্তিমান এবং ভক্তিমার্গের পথিক, একথা বলতে বলতে শ্রীচৈতন্যের চোখ থেকে জলের ধারা নাবলো। সাধ্বী নারী যেভাবে স্বামীর সেবা করেন, জগন্নাথ তেমনি যত্ন ও শ্রদ্ধা নিয়ে শ্রীচৈতন্যের সেবা করতে থাকলেন। কিন্তু কোনো উপায়েই দেহের উত্তাপ কমলো না। ধীরে ধীরে শ্রীচৈতন্যের সর্বাঙ্গ ফুলে গেল। এরপর মাধবের বর্ণনায়—

অক্ষয় তৃতীয়া প্রবেশ।
চন্দন যাত অবকাশ।।
একা সে জগন্নাথ দাস।
মন্দিরে অছি তার পাশ।।

জগন্নাথ দাস ক্রন্দনরত অবস্থায় শ্রীচৈতন্যের মরদেহের কাছে বসে রইলেন। ভোর হল, দু'একজন সেবক উপস্থিত হলেন। তাদের একজনকে জগন্নাথ দাস বললেন, 'এই মুহূর্তে দৌড়ে যাও আর রায় রামানন্দকে খবর দাও— তিনি যেন এখনি এখানে চলে আসেন। খবর পেয়ে রাম রায় দ্রুতবেগে মন্দিরে উপস্থিত হলেন এবং অবস্থা দেখে তাঁর দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা বইল। তিনি পরম যত্নে আর শ্রদ্ধায় শ্রীচৈতন্যের মুখমণ্ডলে আর সর্বাঙ্গে হাত বুলোতে লাগলেন। বুঝলেন সব শেষ হয়ে গেছে।'

রাম রায়ের আদেশ হল, 'আজ মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকবে এবং দেবতার সমস্ত সেবাপূজা বা 'নীতি'ও বন্ধ থাকবে।' এরপর তিনি একজন অশ্বারোহীকে ডাকিয়া তার হাতে রাজার নামে একটি পত্র প্রেরণ করলেন। সেদিন অক্ষয় তৃতীয়া, চন্দনযাত্রার শুভ দিন।' 'পথেই রাজার সঙ্গে অশ্বারোহীর সাক্ষাৎ হল। রাজা চিঠি খুলে পড়লেন আর তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি সোজা মন্দিরে এসে সব কিছু দেখলেন আর শুনলেন। ইতিমধ্যে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হয়েছে...।' 'রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের মরদেহ নিয়ে কি করা কর্তব্য, সে সম্পর্কে রাজাকে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু রাজা দুঃখে প্রায় চেতনাহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মুখ থেকে কোনো কথাই বেরুলো না। তখন রামানন্দই বললেন, 'এই শবদেহ মন্দিরের বাইরে নেওয়ার কোন যুক্তি নেই। গৌড়ীয় ভক্তরা শুনলে এর অনেক নিন্দা প্রচার করবেন, হয়তো মুসলমান রাজাকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবেন। যার মধ্যে সার বস্তু কিছু নেই তার সঙ্গে সত্য-মিথ্যা নানা কথা যুক্ত হয়ে বিবাদ উপস্থিত হবে। এতে আমরাই নিন্দিত হবো। যেহেতু প্রভু মন্দিরেই দেহত্যাগ করেছেন, এর মরদেহ এখানেই সমাধিস্থ করবো। পরে যখন শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা আসবে তখন যাত্রীরা অবশ্যই প্রভুর খোঁজ করবে। তখনই তাঁদের জানানো হবে যে এ প্রভু ঐ প্রভুর দেহেই লীন হয়ে গিয়েছেন। এখন তাড়াতাড়ি 'কোইলী বৈকুণ্ঠে' (জগন্নাথদেবের পুরাতন দারুবিগ্রহের সমাধিস্থান) এই মরদেহ

সমাধিস্থ করবো। ওখানেই জগন্নাথদেবের জীর্ণ দারুমূর্তি সমাধিস্থ করার নীতি প্রতিপালিত হয়ে আসছে। গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব অধোমুখে তাঁর সম্মতি জানালেন। শবদেহ কোইলী বৈকুণ্ঠে বহন করে নিয়ে গিয়ে সেবকদের দ্বারা নির্মিত একটি খাদের মধ্যে সমাহিত করা হল। জগন্নাথ দাস, রামানন্দ আর কয়েকজন সেবক ছাড়া এ কথা আর কেউ জানলেন না। রাজাদেশ ঘোষিত হল— 'এ কথা যেন আর কেউ জানতে না পারে।' এরপ মন্দিরের প্রধানন দরজা খুলে দেওয়া হল।

নিয়ম মতো শ্রীমন্দির সংস্কারের আদেশ দেওয়া হল। সব মন্দির জল ঢেলে ধোওয়া হল আর সেবকেরা সর্বত্র কর্পূর চন্দন আর অগুরু ছড়িয়ে দিলেন। এর কিছু পরে 'চন্দনলাগি' বা দেববিগ্রহগুলিকে চন্দনচর্চিত করে চন্দ যাত্রার আয়োজন শুর হল। ভক্ত যাঁরা উপস্থিত হলেন তাঁরা শুনলেন শ্রীচৈতন্য দারুবিগ্রহে লীন হয়ে গিয়েছেন। চন্দনযাত্রার মহান আনন্দের দিনেও সকলের মুখে বিষাদের ছায়া নেবে এলো। কারো মুখেই আনন্দের স্পর্শ রইলো না। বিদ্যুৎ যেভাবে মেঘের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়, শ্রীচৈতন্য ঠিক সেভাবেই শ্রী জগন্নাথের দেহে লীন হয়ে গিয়েছেন— এই কথা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়লো। সকলেই সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে দুঃখ ভোগ করতে লাগলেন।' (১২৭-১৩৫ শ্লোক)

ড. পাণ্ডা অনূদিত মাধবের পুঁথির শ্রীচৈতন্য প্রয়াণের বিবরণের বৃহদংশ এখানে উদ্ধার করা হল। এই অংশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। অনুবাদক একটি এফিমেরিজের সাহায্যে প্রয়াণের তিনটি নির্ণয় করেছেন ঃ 'এই অক্ষয় তৃতীয়া হল ১৪৫৫ শকাব্দের, ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল রবিবার। এল. ডি. এস পিল্লাই সম্পাদিত 'অ্যান ইন্ডিয়ান এফিমারিজ' ৫ম খন্ড, মাদ্রাজ, ১৯২২, পৃ. ২৬৮।'

মাধব পট্টনায়কের ওড়িয়া গ্রন্থটির অনুবাদ ক'রে ড. পাণ্ডা আশা করেছেন, এরপর থেকে চৈতন্যদেবের প্রয়াণ সম্বন্ধীয় যাবতীয় জল্পনার অবসান হবে; বিশেষত চৈতন্যদেবকে পুরীতে হত্যা করা নিয়ে যে-সব লেখক অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কাহিনী লিখেছেন, তাঁরা বিরত হবেন। বিষ্ণু বাবুর মতে গবেষণার নামে এসব গল্পচর্চা শুধু মিথ্যাচারণই নয়, ওড়িষ্যা ও বাংলার সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ষতিকরও।

বইটির আর একটি সম্পদ অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে বইটির প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে তিনি এটি লিখেছিলেন এবং ড. বিষ্ণুপদ পাণ্ডার অনুবাদ, গবেষণা ও বিশ্লেষণকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

একটা নতুন বছর

বিপ্লব মাইতি

প্রাক্তন ছাত্র

শুরু হল একটা নতুন বছর কিন্তু জানিনা কেমন যাবে এই নতুন একটা বছর। ‘‘মানে ১২ মাস ৩৬৫ দিন’’। তবুও নিজের সাথে চলে যাবে সময়ের এক অগভীর পথ। সেই পথের ঠিকানার মালিক আমি নিজেই। যার লক্ষ হবে নতুন বছরের নতুন কিছু আশা প্রত্যাশার মিলন ঘটানো। যার সাথে লুকিয়ে থাকবে ব্যাথা, বেদনা, কষ্ট, সুখ, ভালবাসা এবং নতুন কিছু শেখা, দেখা, অভিজ্ঞতার নানান প্রতিশ্রুতি।

একটা নতুন বছর হয়তো সবার জীবনেই আসে কিন্তু তার দিনগুলি আমার থেকে আলাদা নতুনত্ব কিছু বোধ করা। নতুন বছরটাকে চালাতে হবে নতুনত্ব কিছু বোধ করে। যার ইচ্ছার প্রকৃতি ও লক্ষ হবে নতুন কিছু ভাবনা চিন্তার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটানো।

নতুন বছরের এক নতুন অভিজ্ঞতা হবে অনেক দীর্ঘ মেয়াদি যার মধ্যে থাকবে নতুন কিছু অভিজ্ঞতা যা আমার জীবনে হয় কিছু শিখিয়ে দিয়ে যাবে যার থেকে আমি কোন বিপদ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাব, বা অন্য কাউকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারব। তাই পেয়েছি জীবনের একটা সুখময় নতুন বছর তাই এই বছরে কিছু একটা করে যেতে চাই। যে কেউ হয়তো ভেবেছিল কোন কিছু করতে পারবো না কিন্তু সেটাই আমি করে দেখাতে চাই। কেউ ছোট বলে অবজ্ঞা করতে নেই। ছোট জিনিসই বেশি দরকারি।

প্রথম দিনের কলেজ

সোনাম বসাক
বি.এ. সাধারণ বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর নতুন পড়ার গণ্ডিতে পা রাখি কলেজের গণ্ডি। প্রথম বার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, সব পুরোনো বন্ধুদের হাত ছেড়ে এগিয়ে আসা নতুন পথের দিকে, ছেড়ে আসা স্কুলের সেই কঠিন শৃঙ্খলা, বাবা মায়ের স্কুলের সামনে ছেড়ে দিয়ে আসা, স্কুলের সেই নিত্যদিনের ইউনিফর্ম, একসাথে টিফিনের সময়ে বেঞ্চ বাজিয়ে গান, সমস্ত পুরোনো স্মৃতি ফেলে এগিয়ে আসি কলেজের দিকে, প্রথমবার মনের ভিতর একটা অজানা ভয় জানা ছিল না কলেজের প্রথম দিন কেমন কাটবে? স্কুল ছেড়ে আসার অনেকটা স্মৃতি দুঃখ সাথে নিয়ে ভর্তি হই ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ এ। কলেজের প্রথম দিন মনের ভয়, নতুন বন্ধু এসব নিয়ে একটা হঠাৎ চাঞ্চল্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়, বুঝে উঠতে পারছিলাম না কোন দিক থেকে কলেজের রুমে যাব, কীভাবে যাব? এসেই একটা কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার অবস্থা, খুব খুঁজে প্রথম দিন খুঁজে পাই আমার ক্লাসরুম, খুব ভয়ে ছিলাম কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই কেমন হবেন? তবে মনের ভিতর ভয়ের সাথে সাথে কোথাও একটা আনন্দ ও কাজ করছিল, যে এখন নিশ্চয়ই অনেকটা বড়ো হয়ে গেছি, সেই কারণে আমি ও কলেজে আসতে পেরেছি। আগে শুধু বড়ো দাদা দিদিদের দেখতাম কলেজে যাচ্ছে, তবে এখন আমিও যাচ্ছি। একটা নতুন অনুভূতি, স্কুলের সেই নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম ছেড়ে দিয়ে কলেজের মধ্যে আসলে সেই ইউনিফর্ম ছেড়ে Casual Dress ব্যবহার করা, আরো অনেক এরকম স্মৃতি ভয় ভালোলাগা, সব কিছু নিয়ে মোটের ওপর কলেজের প্রথম দিন খুব ভালোই কেটেছিল, এখনো সেই প্রথম দিনের কথা ভাবলে হাস্যকর লাগে, তবে নিজের বড়ো হয়ে যাওয়ার কথা ভাবলে আবার একটু সিরিয়াস Mode on করে ফেলি। নিজেকে কলেজের মতো serious তৈরী করি, সেই স্কুল সময়ের পাগলামি ছেড়ে

ধর্মের বিপরীত মানুষ

বিপ্লব মাইতি

প্রাক্তন ছাত্র

ভারতবাসীর নাগরিক হয়েও এদেশে আজ ধর্মের হানাহানির, ভেদাভেদের শিকার এই ব্রহ্মাণ্ডের মানুষ। তার ফলে দেশে এক নতুন ধর্মীয় জীবনশক্তির সঞ্চার ঘটেছে। এর ফলে এই নতুন প্রজন্ম তরুন প্রজন্ম হওয়ার আগেই ধর্মীয় সংস্কারের প্রভাব ঘটেছে। যার ফলে সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের সাথে সংখ্যালঘিষ্ট মানুষের মধ্যে বিরাট বিষন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে নতুন জীবন ধারণের বিকাশ ক্ষমতা থমকে গিয়েছে। তবুও মানুষ যদি মানবাধিকার এর ভাবনাকে জীবনশক্তির নতুন রূপ হিসাবে সঞ্চার করতে হবে। তবেই দেশ সুস্থ ভাবে বেঁচে উঠবে। এগিয়ে যাবে নতুন প্রজন্মের অগ্রগতির দিকে। তাই এই ধর্মতোষণ ও শোষণ নীতির ভাবনাকে বিলুপ্ত করতে এগিয়ে এসে দায়িত্ব নিতে হবে এই নতুন প্রজন্মের তরুণ সমাজকে।

তবে সেই দায়িত্ব এক বিরাট দায়িত্ব। যা এক কেন্দ্রিভূত রাষ্ট্রের পালনীয় আদর্শ কর্তব্য হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতা দেশ হিসাবে এই সমাজ ও দেশবাসীর মধ্যে বিস্তার ঘটাতে হবে। যা এই ধর্মের বিপরীতে গিয়ে সমাজের বৈচিত্রময় পরিবেশের ভেদাভেদের বিভাজনের উপর এক নতুন ধরনের বিশেষ মূল্যবোধ দিয়ে সামাজিক পারস্পরিক সম্পর্ককে রক্ষা করার দায়িত্ব কে অজ্ঞাত রাখতে হবে। আর সেইটাকেই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে পালন করতে হবে। তবুও এই সবের জন্যই দায়ি এই মানব জগৎ যার দ্বারা প্রভাবিত এই সমাজ আজ কু-সংস্কার আচ্ছন্ন।

আজ সেই সংস্কার রাষ্ট্রের নামে অপব্যবহার করে সমাজ এবং মানব জাতির মধ্যে হিংসা, হানাহানির বিস্তার ঘটিয়েছে, হয়তো এই কারণেই আমাদের প্রজন্মের মানুষেরা রাষ্ট্রবাদী ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সাধারণ মানুষকে আজ হিংসার চোখে দেখছি। যার ফলাফল গবেষণা ও ইতিহাসে কখনও দেখা পাওয়া যায়নি।

তাই এই ২০১৭ বছর আজ আমাদের মনে করিয়ে দিয়ে গেল, কেন জাতি, যুক্তিবাদী, রাষ্ট্রবাদী আর ধর্মের মধ্যে জটিল সম্পর্কটি আরও বেশি জটিল করে বিচার করা দরকার। আদর্শবাদী রাষ্ট্রের কবল থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে উদ্ধার করা দরকার তার জন্য এক নতুন

সামাজিক অর্থ তৈরি করা দরকার। ধর্মনিরপেক্ষতাকে বলতে আমরা যেন বুঝি অতি প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ। যার মধ্যে থাকবে দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠি ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন ও সাম্য। সাংস্কৃতিক সংযোগ, বৌদ্ধিক সংলাপ এবং পারস্পরিক সন্মান করার প্রয়াস। তার বদলে একটা প্রচ্ছন্ন একত্ববাদ তৈরি করা। অর্থাৎ সবার এক রকম হতে পারার উপর যদি জোর দেওয়া হয় তবে তার উপর ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভাব হ্রাস পাবে। এর ফলে ধর্মের কুসংস্কার ফলে অত্যাচার থেকে দেশে অধিকাংশ মানুষ কোন না কোন ভাবে ভালবাসায় বিশ্বাসী হবে।

অবশ্যই আজ আমাদের প্রধান কাজ ধর্মীয় কবল থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করা এবং মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু সেই কাজ করতে গেলে আবার নতুন করে মানবচেতনার উন্নতি সাধন করতে গেলে ধর্মের বৃহত্তর চেতনার এবং ধর্মীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের বিরোধিতা করতে হবে। তবুও বিরোধিতার সময় ধর্মীয় সংখ্যা গুরুবাদের প্রতিরোধ তৈরি করার সময়ে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মীয় ভাবধারাকে ভিতর থেকে সম্মান করলে চলবে না। মনে রাখ তে হবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ কোনও না কোনও ভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসী। কিন্তু সেই বিশ্বাসের নামে, অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি আক্রমণ কিংবা ঘৃণা তোষণ করার মতো হীন কাজ না করে অন্যভাবে ধর্মের সব রকম অনুষঙ্গ ক্ষেত্রকে পরিহার করে মানব ধর্মের সবটুকু অধিকারের ও আদর্শের প্রাণ ভাবনার ঘনিষ্টতা বাড়াতে হবে। ধর্ম ও ধর্মীয়, হিন্দু, মুসলিম, খি ্স্টান, শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের মধ্যে সব রকমের ঐক্য সাধনের ভাতৃত্বদ্বয় এর সম্মান রক্ষার আদর্শগত এক প্রতীক হিসাবে কাজ করার জন্য ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে ও রক্ষণশীলতাকে চেতনার সাধারণ মেলবন্ধন গড়ে তুলতে হবে। যাতে ভারতীয়দের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার প্রকাশ পায়। এর থেকেই বোঝা যাবে ‘‘মানব জীবনের মিলনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল ধর্ম’’। আর এর একমাত্র প্রতিকার হল ধর্মনিরপেক্ষ ও আন্তঃশিক্ষার মধ্যে আদর্শের প্রতীক হিসাবে শান্তিকে বেছে নেওয়া।

ভ্রাতৃত্ব আর শান্তির পথ ধর্মনিরপেক্ষতাকে এক বড় আদর্শের একমাত্র পথ আমরা যেন ভুলে না যাই। আমরা যেন মনে রাখতে পারি, মানব জাতির ব্যক্তিগত জীবনে গভীর ভাবে ধর্ম পালন করেও দেশের মানুষের স্বার্থে এবং দেশ ও সমাজের মধ্যে মেল বন্ধন প্রতিষ্ঠা করা।

ছুটির মজা

কৌশিক মুখার্জী
বি.এ. (বাংলা অনার্স)

মাঝে মধ্যে মানুষের মন চায় একটু অবকাশ, জীবনে একটু নতুন ছোঁয়া— আর এই নতুনত্বের খোঁজেই আমরা কজনে মিলে বেড়িয়ে পড়লাম পঞ্চ লিঙ্গেশ্বর, কুলডিহা— সিমলিপাল ভ্রমণে প্রথম থেকে আমাদের ঠিক করা ছিল এবার পাহাড় বা সমুদ্রে নয় প্রাকৃতিক বনে বন্য প্রাণীর আবার বিচরণ স্বচক্ষ্যে দেখার সঞ্চয় করতেই বনভ্রমণ।

২০১৩-র ২৩শে জানুয়ারী পূর্ব নির্ধারিত সময়ে সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এবার যাত্রা শুরু হলো ধৌলিতে করে। সঙ্গী ছিল অপর্যাপ্য খাদ্য। রাস্তার দুধারের সৌন্দর্য্য। কলকাতা থেকে বালাসোর মাত্র ৪-৫ ঘন্টার মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম। বালাসোর স্টেশন থেকে গাড়ী আমাদের নিয়ে চললো পঞ্চলিঙ্গেশ্বর। রাস্তার দুপাশে কখনও ধূ ধূ মাঠ, রাস্তার দুপাশে কখনও চাষের জমি, ঘর বাড়ী দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম গেস্ট হাউস সোনালীতে। আর এই জায়গাটা ঠিক পাহাড়ের কোলে। সাময়িক এই বাসগৃহ থেকে সামনেই সুউচ্চ নীলগিরি পাহাড়। মন বলছে কখন গিয়ে পাহাড়টায় উঠব। স্নান-খাওয়া সেরে শুরু হল নীলগিরি আরোহন। মাঝে মধ্যে হাঁফিয়ে পড়ছি। আবার খানিকক্ষণ বিশ্রাম। এইভাবে প্রায় ঘন্টা দুয়েকের পর যখন উপর এসে পৌঁছালাম তখন সব ক্লান্তি উধাও। সমানে যতদূর চোখ যায় শুধু পাহাড়, আর পাহাড় কোনটা সবুজ কোনটা রুক্ষ এক অসাধারণ দৃশ্য।

এখান থেকে আমরা গেলাম রিসায়া জ্যাম পথের মাঝে পড়লো এক আদিবাসীদের গ্রাম। দেখলাম আদিবাসী মহিলারা বিকেলের কাজ সারতে ব্যস্ত। আদিবাসী শিশুগুলি বিকেলের খেলায় ব্যস্ত।

পরদিন অর্থাৎ ২৪শে জানুয়ারী গেলাম দেবকুন্ড মা সীতার লহান্ততম পীঠ নামে কথিত। খানিকটা হাফিয়ে খানিকটা লাফিয়ে অর্থাৎ অনেকটা বিশ্রাম নিয়ে অবশেষে ২৯০টি সিঁড়ি পেরিয়ে এসে পৌঁছোলাম দেবকন্ডু। মন্দির দর্শন করে ফিরেত ফিরতে আমাদের সারাদিন লেগে গেল।

এবার গন্তব্য কুলডিহা ফরেস্ট। ২৫শে জানুয়ারী সকালে জলযোগ সেরে গাড়ীতে উঠলাম

জঙ্গল পরিদর্শনের জন্য। জঙ্গলে প্রবেশের সমস্ত সরকারী অনুমতি জোগাড় করে নিয়ে আমাদের গাড়ী ছুটে চললো বনভূমির বুক চিরে। রাস্তার দুপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের কৌতুহলী চোখ দুটিকে অন্যমনস্ক করে রেখেছিল। যতই বনভূমির ভেতরে প্রবেশ করছি মন ও চোখ ততই সজাগ হয়ে উঠেছে, প্রার্থনা করছি কিছু যেন একটা দেখতে পাই। নইলে এ যাত্রা বৃথা। হঠাৎ-ই ড্রাইভার গাড়ীর গতি ধীরে করে সামনের গাছটার দিকে তাকাতে বললেন। আমরা সকলে হুমড়ী খেয়ে গাছটায় তাকিয়ে দেখলাম একটা জংলী কাঠবেড়ালী। এত বড় ও লোমশ গাঢ় বাদামী রং এর কাঠবেড়ালী আমরা কেউই এর আগে দেখিনি। যাই হোক আমাদের প্রার্থনা সফল হোল, কিছু একটা দেখলাম। আমরা এগিয়ে চললা, সূর্যের রক্তিম কিরণে উৎভাষিত সমগ্র বনভূমির শ্যামল বনানী যেন আমাদের আগমনকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। বাবা প্রাকৃতিক দৃশ্য বাক্সবন্দি করতে ব্যস্ত। আর আমরা অপলক নয়নে অদেখাকে দেখার অপেক্ষায় অপেক্ষমান আর ছোট্ট রিয়ান তো ঘুমিয়ে কাঁদা, কিন্তু হায় কাকস্য পরিবেদনা চতুস্পদে কোন প্রকার প্রাণী পর্যন্ত দৃষ্টি গোচর হলো না। অবশেষে ক্রমশ অন্ধকার এগিয়ে আসায় আমরা আশ্রয় নিলাম কুলডিহা ফরেস্ট রিসর্টে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম, হঠাৎই ড্রাইভার কাকু দৌড়েয়ে এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেলো। নিঃশব্দে গিয়ে দেখি বন থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি ময়ূর। কি বড় কি অপরূপ শোভা। এরই মধ্যে জঙ্গল থেকে ভেসে এলো নানা পাখী ও হাতির ডাক। নিকষ কালো অন্ধকারে শুধুমাত্র গাড়ীর হেডলাইটের উপর ভরসা করে আমাদের যান ছুটে চললো। গাড়ীর মধ্যে শুধু নিস্তব্দতা। কিন্তু আমার মন খুব খুশি। এর রেশ থেকে যাবে অনেক দিন। হয়তো এর টানেই আমি আবার এখানে আসার জন্য উৎসুক হয়ে থাকব।

২৬শে জানুয়ারী পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মন্দিরেও এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসা ঝরণার জলের ভেতরে হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম পাঁচটি শিবের মূর্তি— যা পঞ্চলিঙ্গেশ্বর নামে খ্যাত। মন্দির দর্শন সেরে আমরা রওনা দিলাম চাঁদিপুরের দিকে। ভালোই হলো— জঙ্গল ভ্রমণের পর সমুদ্রে পা ভেজানোর আনন্দটুকুই বা বাকী থাকে কেন? কিন্তু চাঁদিপুরে এসে সে আশা পূর্ণ হলো না। কোথায় জল, চারিদিকে খালি বালি আর কাদা। অতঃপর বালিতেই খানিকটা ছুটোছুটি করে আনন্দ করে নিলাম। আমার মনে হয় জীবনের সমস্ত কিছুই উপভোগ্য। আনন্দময়। তাই-ই বন্যপ্রাণী না দেখতে পাওয়ার হতাশা। সমুদ্রের জলে পা না ভেজাতে পারার দুঃখ সব ভুলে এই চার দিনে হৈ হুল্লোড়, হাসি ঠাট্টা আর ভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা স্মৃতিই আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে সারাজীবন।

জীবনের লক্ষ্য

বিপ্লব মাইতি
প্রাক্তন ছাত্র

জীবনের কেরিয়ারের সিড়িতে ওটার সময় একটা চ্যালেঞ্জ-এর স্মিথ সকলের মধ্যে কাজ করে। এই স্মিথটা হল সিড়ির প্রথম ধাপ যার স্লোপটা খুব মসৃণ। আর এই কারণেই সিড়ির প্রথম ধাপেই স্লোপ এর বদলে প্লেটো থাকলেই জীবনের কেরিয়ারে বিপত্তি ঘটে প্রত্যেকেরই। কেউ কেউ বিস্মিত হয়ে পড়ে। যখন সিড়ির স্লোপ হঠাৎ বেমানান হয়ে পড়ে কিংবা সিড়ির উচ্চতা বেড়ে যায়। আজকালকার দিনে যে কোন জীবনের কেরিয়ার তৈরি করাই হল একটা চ্যালেঞ্জের অ্যাডভেঞ্চার এর স্পোর্টস-এর মত। যার খেলোয়াড় নিজেই যা দারুন উত্তেজকমূলক এবং একই সঙ্গে ভয়ের। তাই যারই জীবনের লক্ষ্যের সিড়ির প্রথম ধাপের ওঠার চেষ্টা করবে। তাদের উচিত লক্ষ রাখা যাতে কোনভাবেই পদস্থলন না হয়।

জীবনের থেকেই শুরু হয় কেরিয়ারের লক্ষে পৌঁছানোর উঁচুনিচু দিয়েই তৈরি হয় নানা রকম অভিজ্ঞতা। এই সমস্ত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে চরাই উৎরাই পেরিয়ে যারাই জীবনের কেরিয়ারের সঠিক লক্ষে পৌছাতে পারবে এবং সফল কেরিয়ারের অংশীদারি হতে পারবে। তারাই হবে জীবনের আদর্শ ও সঠিক জীবনের প্রকৃত পথের পথিক।

যার লক্ষে পৌছানোটা অত্যন্ত শ্রম সাধ্য। যার জন্য শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রস্তুতি থাকতে হবে সর্বদা।

সূর্য

আশামনজয় দোলাই
বি.এ. সাধারণ বিভাগ

উজ্জল নক্ষত্র তুমি জ্বলো নিশি দিন
তোমার আলোতে হয় অন্ধকার বিলীন।
নিশিদিন জ্বলো তুমি বিনা কোনো স্বার্থে
জগৎ সংসারকে আলো দিচ্ছ বিনা অর্থে।
উজ্জ্বল বর্ণ তোমার গায়ের রং লাল
বিশ্ব জগৎকে তুমি করেছ বেহাল।
এত উজ্জ্বল বর্ণ তোমার, তাকাতে কেউনা পারে
যদিও কেউ তাকাতে যায় চোখ থেকে জল পড়ে।

ধন্য তুমি, ধন্য তোমার উজ্জ্বল বর্ণ
জগৎকে আলো দিয়ে করেছ তুমি ধন্য।
অনেক অতীতে সৃষ্টি তোমার থাকবে ভবিষত
জগৎটাকে দেখছ তুমি পরিবর্তন হতে।
একই স্থানে ছিলে তুমি, থাকবে চিরতরে
পৃথিবীর প্রাণীজগৎ যাচ্ছে তোমায় ছেড়ে।

गुरु का महत्व

स्वाती शर्मा
अध्यापिका, हिन्दी विभाग

नहीं है आज मेरे पास शब्द
कैसे धन्यवाद मैं आप सबका
हर पल बस चाहिए मुझे
आप सबका आशीर्वाद।

मैं आज जहाँ हूँ,
उसमें है बड़ा योगदान,
आप सबका जिन्होंने,
मुझे दिया इतना ज्ञान।

मैं आज करती हूँ दिल,
से आप सब का सम्मान,
आप सब को,
मैं करती हूँ शत् शत् प्रणाम।

कफन का शहंशाह

दिल प्रसाद
विद्यार्थी, हिन्दी विभाग

जो रोटी के लिए तरस गया
वह रहा कफन का शहंशाह,
अर्थी ऐसी सजी उसकी
जौसी रही न उसकी चाह।
जिन्दगी चिथड़ो मे लिपटी हुई शर्माई थी
उस समय उस पर किसी को दया न आई थी,
आज फूलों से उसे लोगों ने सजाया है।
जिसे न मिल सकी जीवन में चाहपाई थी।
मृत शरीर पर चन्दन का लेप देते हैं
उठा कर फिर उसे अग्नि में फेंक देते हैं,
मरे शरीर की आत्मा कहीं बिलरवती है
मुँह पर घी सटा जिससे वो दुजा लेते हैं।
बड़ी अजीब दास्तान है यहाँ गरीबी का
छुड़ा लेते हैं दामन, जिनसे रिश्ता है करीबी का,
ये सारी दुनिया एक जाल की बुनावट है
हाल बेहाल है, दुनिया में बदनसीबी का।

मेरे प्यरे पापा

नेहा रवि दास
हिन्दी विभाग

जब मैं सुवह उठी
तो कोई बहुत थक कर थी
काम पर जा रहे थे
वो थे पापा...

जब मम्मी डाट रही थी
तो कोई चुपके से
हसा रहे थे,
वो थे पापा...

ये दुनिया पैसो से चलती है पर
कोई सिर्फ मेरे लिए
पैसे कमाये जा रहे थे,
वो थे पापा...

पेड़ तो अपना फल खा नही सकता
इसलिए हमे देते है
पर कोई अपना पेट खाली रखकर
भी मेरा पेट भड़े जा रहे थे,
वो थे पापा...

खुश ते मुझे होना चाहिए कि को
मुझे लिये पर मेरे जन्म लेने
की खुशी कोई और मनाए जा रहे थे,
वो थे पापा...

मैं अपने बेटी शब्द को
सार्थक बना सके या नही, नही पता
पर कोई बिना स्वार्थ के अपने
पिता शल्ध को सार्थक बनाए जा रहे थे
वो थे पापा...

सपने तो मेरे है पर
उन्हे पूजा करने का रास्ता
कोई और बनाए जा रहे थे,
वो थे पापा...

घर मेन सब अपना प्यार दिखाते है
पर कोई बिना दिखाए भी
इतना प्यार किये जा रहे है,
वो है पापा...

मैं तो सिर्फ अपनी खुशियों में
हँसति हूँ, पर मेरी हँसी देख कर
कोई अपने गम भुलाये जा रहे थे,
वो थे पापा...

National Cadet Corps

Kakoli Sengupta
Parttime Teacher, Dept. of English

NCC stands for National Cadet Carps which is the Indian military cadet corps. It helps the youth to tune-up and prepare themselves in all three forces that is the Indian Army, Indian Navy and Indian Airforce. Regular Drill, Work Out, Rifle, SLR, LMG, Stan Gun, 2 Mertar, Grendade, Pistol Training, first had exposure of weapon training. Directional training, geographical location and undastanding of maps are taught to the cadets. C certificate holders who have marks above 50% are given special prerogatives in Army, Airforce and Navy. There are exemptions and dispensations for the skilled cadets.

তুমি আছ তাই প্রেম আছে তাই

শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা
আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

তুমি আছো তাই, প্রেম আছে তাই,
জীবনে জীবন সুর বাজে—
তুমি আছো তাই, এ বিশ্ব-পৃথ্বী
বুকভরা নিঃশ্বাসে বিশ্বাসময়,
মৃতুকাঁপানো দুরন্তঝড়ে
ঠিকানাবিহীন সীমান্ত পেরিয়ে আসি
ভাবতে ইচ্ছা হয়।
তুই আছো তাই, নক্ষত্র হাসে
যৌবন— জ্যোৎস্নায়,
সাগর বলে আয় ছুটে আয় আয় আয়...
তুমি আছো তাই, প্রেম আছে তাই
মরুভূমে বৃষ্টি নামে।
তুমি আছো তাই
পাহাড় ডাকে
লিন্‌ডেন দেবদারু তরুতলে।
তুমি আছো তাই,
এ কবোঞ্চ ওষ্ঠ ভরে ওঠে
উষ্ণ— চুমায়;
তুমি আছো তাই
স্বপ্ন দেখি পৌঁছে যাব—
অযুত অনাগত সময়ের সিঁড়ি বেয়ে
শপথ দ্রাঘিমায়।।

জীবন

সাগর প্রামাণিক

প্রাক্তন ছাত্র

জীবন বড়ো অবুঝ তাই মানে না কোনো বাঁধা।
জন্ম থেকে মৃত্যু নিয়ে জীবন গড়ে ওঠা।।
জীবন বড়োই অল্প সময় যায় না ধরে রাখা।
স্রোতের মতোই জীবনও তাই যায় যে চলে একা।।
জীবন মানেই রাতের আকাশে ছোট্ট একটি তারা।
জীবন মানে মনের মাঝে বন্ধু আনা গোনা।।
জীবন মানে হাসি থেকে দুঃখ কান্না ভরা।
নইলে জীবন দেবে ফাঁকি তুমিও হবে একা।।

বন্ধু নিয়ে প্রশ্নোত্তর

বিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য
বি.এ. সাধারণ বিভাগ

বন্ধু মানে কী চিরসাথী, নাকি একটুখানির সঙ্গী?
বন্ধু তো হয় নবীন এবং পুরানো
বন্ধু মানে তো হারানো সুর নতুন করে পাওয়া।

বন্ধু মানে কী এখন তুই, অভাব নেই, পরে আরেকজন?
বন্ধু মানে ‘তুই’, ‘আমি’ আর আরও সকলজন
বন্ধু মানে তো একত্রে মিলেমিশে হই-হট্টোগোল।

বন্ধু মানে কী পরীক্ষার সময় শুধুই প্রতিযোগিতা?
বন্ধু মানে তো ‘গ্রুপস্টাডি’ একত্রে আলোচনা করি,
বন্ধু মানে তো তুই’ও পড়, আমিও এখন পড়ি।

বন্ধু মানে কী বঞ্চিত হওয়া, যখন এক ছেলের প্রেমে দুজনেই পড়ি?
বন্ধু মানে তো আগে বন্ধুত্ব, ছেলে তো অনেক পাব,
বন্ধু মানে তো চির পুরানো চেনাশোনা, হাতে না দেওয়া পরিবর্তন।

বিদেশ

শিধু মণ্ডল
বি.এ. সাধারণ বিভাগ

প্রাতে আসি রাতে যাই
পলিথিনে খাবার খাই।
কাজে কাজে জীবন শেষ
এর ই নাম যে বিদেশ।
বাড়ির মানুষ মনে করে
আমি আমি সুখে
কি যে ব্যাথা জমে আছে।
আমার ভাঙা বুকে
দুঃখ কষ্ট বোঝার মত
আপন মানুষ নাই
আমার এই কষ্টের কথা
কাকে বোলবো ভাই।
অনেক কষ্ট হয় মাগো
ঝরে মাথার ঘাম।
অল্প টাকা রোজগার বলে
কেউ দেয় না দাম।
মাসের পর মাস কাজ করে
বেতন পাইনা হাতে
সেই চিন্তায় আমার
ঘুম আসেনা রাতে।
কেমন করে দেশে আসবো
পাইনা ভেঙে কূল
নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করি
সবই আমার ভুল।

Incomplete Knowledge is Disastrous
Alpa Bidya Bhyankari

Rajlaxmi Baruigupta
Ex.Student

Long ago, there was a village named 'Bidyapur'. But unlike its name, none of its residents were literate. Nobody, other than the postman even knew the alphabets. There was not a single educational institute nearby. Thus, the people living there had a huge craze for the people who were literate. Among others, they respected literate people from Kolkata the most.

Once, a farmer of 'Bidyapur' named Balmiki, fixed his daughter's marriage with a boy from Kolkata named'Bidyapati'. His whole family was very happy and proud as it would be the first marriage of a 'Kolkata boy' and a village girl, to be witnessed by the whole village. They already assumed that, as Bidyapati was from Kolkata, he would definitely be well educated and would know how to read and write.

But, here, back in Kolkata there was a whole different story. 'Bidyapati' was a mere carpenter, who did miscellaneous household carpentary in the local streets and lanes of Kolkata. He was not at all literate. Once his enthuseastic but he even failed twice in the admission test only ! So, there was pretty least chances of him, learning even the alphabets. He was a full on illiterate and foolish as well.

Being the groom, Bidyapati was sure enough that his in-laws would ask him to read or write and show his brilliance. But, he was sure enough that he would not be able to do so, as it would become a matter of his prestige in front of the whole village, he went to 'Soham', his childhood friend to seek help. Soham, on the other hand, was a tutor and premary school teacher. Bidyapati had to leave for Bidyapur the very next day, so Soham could not teach

him much. He took him to his school, took a chalk and wrote a 'Big' - 'A' on the blackboard. Bidyapati practiced it the whole night and was overwhelmed learning the first alphabet. He could now write 'A' on the blackboard without any error and was proud to flaunt it proudly. The next day, he left for Bidyapur with his relatives for his marriage ceremony.

Great preparations were made for such a grand wedding just because the groom was a 'well educated' Kolkatan boy atleast, what they thought him to be ! The whole village assembled at the Railway station to receive the groom. Bidyapati didn't even was not less. He wore a three piece suit with a bow along the collars, alongwith black well polished shoes and three fountain pens in his front coat pocket. His hair was well combed and a sunglass added much to the glory. The villagers were very impressed as if Bidyapati was literally looking like a 'Professor'. Everyone was mesmerised by his pleasing personality. He was taken to the venue of the marriage in a horse drawn decorated chariot and soon the marriage began.

In the meantime, the postman came with a telegram for Balmiki. But as the father of the bride, was too busy with the customs and rituals of marriage, the postman handed over the telegram to a child and asked him to tell him that he would came later to read out the telgram. (N. B. -At those times, as the postmans were the only literate people, they used to read out the letters and telegrams in exchange of some money. They were the only people who could read out the letters and telegrams).

The child gave the telegram to Balmiki and narrated what the postman had said. But being a proud 'father-in-law' of an educated 'son-in-law' from Kolkata, he announced that Bidyapati would head out the telegram infront of the whole village'soon after the marriage ceremony got over.

As soon as the marriage rituals were over, a royal chair was laid out on the stage and microphones and soundboxes were adjusted.

All the villagers sat in front of the stage as if some lecture was about to begin. Bidyapati, in a very confident manner, took the telegram from Balmiki and examined it carefully. Then with a wicked smile on his face, he said, "Huh!!! Just a telegram! I thought you would ask me to read out a epic or so... No problem... I'll read it out for you! He.. he... he..!"

Then he took the telegram chose to his eyes and began to examine it carefully. His eyes shrinked as he took it nearer to his eyes. The very next moment, tears rolled down his cheeks and he started crying very loudly.

Great preparations were made for such a grand wedding just because the groom was a 'well educated' Kolkatan boy atleast, what they thought him to be ! The whole village assembled at the Railway station to receive the groom. Bidyapati didn't even was not less. He wore a three piece suit with a bow along the collars, alongwith black well polished shoes and three fountain pens in his front coat pocket. His hair was well combed and a sunglass added much to the glory. The villagers were very impressed as if Bidyapati was literally looking like a 'Professor'. Everyone was mesmerised by his pleasing personality. He was taken to the venue of the marriage in a horse drawn decorated chariot and soon the marriage began.

In the meantime, the postman came with a telegram for Balmiki. But as the father of the bride, was too busy with the customs and rituals of marriage, the postman handed over the telegram to a child and asked him to tell him that he would came later to read out the telgram. (N. B. -At those times, as the postmans were the only literate people, they used to read out the letters and telegrams in exchange of some money. They were the only people who could read out the letters and telegrams).

The child gave the telegram to Balmiki and narrated what the postman had said. But being a proud 'father-in-law' of an educated 'son-in-law' from Kolkata, he announced that Bidyapati would

head out the telegram infront of the whole village'soon after the marriage ceremony got over.

As soon as the marriage rituals were over, a royal chair was laid out on the stage and microphones and soundboxes were adjusted. All the villagers sat in front of the stage as if some lecture was about to begin. Bidyapati, in a very confident manner, took the telegram from Balmiki and examined it carefully. Then with a wicked smile on his face, he said, "Huh!!! Just a telegram! I thought you would ask me to read out a epic or so... No problem... I'll read it out for you! He.. he... he..!"

Then he took the telegram chose to his eyes and began to examine it carefully. His eyes shrinked as he took it nearer to his eyes. The very next moment, tears rolled down his cheeks and he started crying very loudly.

ক্রীড়া সংবাদ

সুবিমল দেব
অধ্যাপক, শারীর শিক্ষা বিভাগ

২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই আমাদের কলেজের Games and Sports Department সাড়া জাগানো সাফল্য এনে দিয়েছে। Kolkata Medical College আয়োজিত Inter College Volley ball tournament এ আমাদের কলেজ Runner up হয়েছে। প্রদর্শন আমরা বিভিন্ন জায়গায় Best performer এর পুরস্কার অর্জন করেছি। Inter College Dist Athletic meet আমরা ৪টি স্বর্ণপদক সহ মোট ১১টি পদক আর্জন করেছি। আমাদের কলেজের মহিলা অ্যাথলেট টিম Champion of Champion ট্রফি অর্জন করেছে। পরপর দু বছর আমরা এই ট্রফি অর্জন করে আমাদের মহিলা অ্যাথেলেটরা এক দৃষ্টান্তমূলক নজির সৃষ্টি করেছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজের সাফল্যের রথ তর্‌তর্‌ করে এগিয়ে চলেছে। ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজের Principal Sir ও President Sir-এর আশীর্বাদ ধন্য আমাদের ছেলে ও মেয়ে ক্রীড়াবিদরা ভারতছাড়ো আন্দোলনের ৭৫ বছর পূর্তি ও আমাদের কলেজের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এবং সারা বিশ্বকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তোলার উদ্দেশ্যে ভারত বাংলাদেশ সংহতি যাত্রার আয়োজন করেছে। মাননীয় Principal Sir এর নেতৃত্বে আমরা কলেজ থেকে অত্যন্ত সফলভাবে ভারত বাংলাদেশ সংহতি যাত্রা সম্পূর্ণ করে এসেছি। আশা রাখি আগামী দিনে আমাদের কর্মকাণ্ড আরও ব্যাপৃত হবে।